কথাসাহিত্য

৪২ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা আশ্বিন, ১৩৯৯
Vol. 42 No. 12 September, 1992

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

পথে ও পথের প্রান্তে ১

ধারাবাহিক উপন্যাস

এঘর ওঘর / আশাপূর্ণা দেবী ৩
মুশকিল আসান / সমরেশ মজুমদার ১৭

ধারাবাহিক স্মৃতিকথা

বিবাহ ও কলকাতায় দশ বছর / অমিয়া চৌধুরাণী ৩০

প্রবন্ধ

শরৎচন্দ্র ও বাংলা ছবির কাহিনী /
ডঃ নিশীথকুমার মুখোপাধ্যায় ৫৩
প্রেমেন্দ্র মিত্র / প্রসিত রায় চৌধুরী ৫৯
দৃষ্টিপ্রদীপ / অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ৭২

সমালোচনা

গ্রন্থজিজ্ঞাসা / সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগন্নাথ ঘোষ ৬৭

গল্প

প্রতিশ্রুতি / ভবতোষ দত্ত ৪
ফেরা / অনুপ ঘোষাল ৯
এভারগ্রীন / তনুকা ভৌমিক ২২
বাঁচার লড়াই / শেক বাকের আলি ৩৬
সুখ শান্তি স্বাধীনতা / তৃপ্তি সেনগুপ্ত ৪৯

রম্যরচনা

ভিনডালু কারী / হিরণ্ময় ভট্টাচার্য ৪৫

কবিতা

কান্নার শক্তি কোথায় / গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায় ১৫
পুনরাগমনে / প্রমথনাথ মিশী ১৬
দাও নির্জনতা আর অন্ধকার / সুদেষ্ণা পাল ১৬
হঠাৎ বিপন্ন পিতার মুখ / নিভা দে ২১
অন্ধকারের ইজেলে / কল্যাণ মৈত্র ৩৫

এই সংখ্যার মূল্য ৪·০০। সডাক বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৬০·০০।

কার্যালয় : কথাসাহিত্য, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩ ফোন : ৩২৫০৫৪, ৩১৬৪২০

Office : Katha Sahitya, 10 Shyama Charan De Street, Calcutta-73, Phone : 325054, 316420

এভারগ্রীন

তনুকা ভৌমিক

'ওঃ, কি দেখাচ্ছে! ফ্যানটাসটিক! সুপার্ব! দেখেছ মা?'

কোন সাড়া না পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে শুভ দেখে, পাশের সিটে মা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মাথাটা একপাশে হেলে পড়েছে, কেমন যেন বেকায়দায়। বাইরে থেকে দেখলে শুভর অস্বস্তি লাগলেও মা-র কোন হুঁশ নেই; মুখ সামান্য হাঁ করে ঘুমিয়ে পড়েছে, যেন বাড়ির বিছানায় শুয়ে। শুভর দৃষ্টি মাকে পেরিয়ে গেল বাবার দিকে, ওধারের জানলার পাশের সিটে বসা। বাবাও তথৈবচ, তবে বাবার বসার ভঙ্গীটা মিলিটারি। সিটে সোজা হয়ে অ্যাটেনশনে বসে, দেখে মনে হতে পারে সজাগ। কিন্তু চশমার ফাঁক দিয়ে নিদ্রিত চোখ শুভর দৃষ্টি এড়ায় নি, কারণ বাবার ঘুমোবার এই ভঙ্গী তার অনেক দিনের চেনা।

ধুত্তোর! এরা বেড়াতে আসে কেন? শুভর মেজাজ চড়তে আরম্ভ করল। কলকাতায় বসে ঘুমোলেই পারত। এদিকে দু'ধার দিয়ে কুলু থেকে মানালি যাওয়ার পথের স্বর্গীয় দৃশ্য ছুটে চলেছে, আর মা-বাবা ঘুমোতে ব্যস্ত। শুভ এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল যে বাসে আর যে কজ'ন ট্যুরিস্ট আছে, তারা সকলেই উপভোগ করছে হিমাচলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। নাঃ, মা-বাবার উপর বিরক্ত হয়ে শেষে নিজেই মিস্ করবে এই সব সিনারি! তাড়াতাড়ি শুভ আবার জানলার বাইরে চোখ ফেরায়। ওর সিট পড়েছে বাসের ডানধারে, অর্থাৎ জানলা দিয়ে তাকালেই দেখতে পাচ্ছে পাশে পাশে বিয়াসের ছুটে চলা। অপূর্ব, অপূর্ব! আবার মনে মনে তারিফ করল শুভ। যত তারা উঁচুতে উঠছে, তত যেন বিয়াসের—অর্থাৎ বিপাশা নদীর গতিপ্রকৃতি পাল্টাচ্ছে। শান্ত নিস্তরঙ্গ নদী থেকে সে হয়ে উঠছে উচ্ছল। তার বুকে কত ছোট-বড় পাথর, যাতে ঘা খেয়ে স্থানে স্থানে ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি করছে।

মানালি পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় সন্ধে। এর আগেই অবশ্য বাবা-মা জেগেছেন। চারপাশের দৃশ্য দেখে দুজনেই খুশী। বিশেষতঃ মা।

'কি সুন্দর জায়গা রে, শুভ! আরও কয়েকদিন থাকার প্ল্যান করে এলে হত!'

'বাবাকে তো বলেছিলাম, মাত্র চার-পাঁচ দিন হাতে নিয়ে এলে হয় না। এখান থেকে কত জায়গায় যাওয়া যায়!' শুভ আফসোস করে। পরক্ষণেই যোগ দেয়, 'অবশ্য তোমাদের বেড়ানো মানে তো ঘুম! যা সব সিনারি মিস করলে, আমার মনে হচ্ছিল ঠেলা মেরে জাগিয়ে দিই!'

'শুভ, সুটকেস দুটো নামা। মানালি এসে গেছে।' বাবা ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

এত ব্যস্ত হওয়ার কি আছে? বাস থামুক আগে। শুভ মনে মনে বিরক্ত হয়। বাসসুদ্ধ সব লোক বসে আছে, শুধু তাদেরই তাড়া। মিছিমিছি নিজেদের দিকে লোকের অ্যাটেনশন টেনে আনা। সতেরো বছর বয়সে শুভর মনে হয়, যেন পৃথিবীর সব লোক ওকে দেখার জন্য, ওর খুঁত ধরার জন্য, ওকে নিয়ে হাসাহাসি করার জন্য উন্মুখ। যাই হোক্, বিরক্তি চেপে উঠে দাঁড়িয়ে সুটকেস দুটো সিটের উপরের বাঙ্ক থেকে টেনে নামায়।

বাস থামতে মালপত্র নিয়ে বাইরে এসে নামে বাসের যাত্রীরা। এতক্ষণ বসে কাটিয়ে সকলেরই হাত-পা ধরে গেছে। পা টান-টান করে ছোটখাট একসারসাইজ করে দেহকে সচল করে নেওয়ার চেষ্টা করে শুভ। এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটু হতাশ হয়। মানালি জায়গাটাকে সেরকম এক্সাইটিং লাগছে না তো! যে অঞ্চলে বাস ওদের নামিয়ে দিয়েছে, সেটা একটা ছোট বাজার বলে মনে হচ্ছে। বেশ চওড়া, পাকা রাস্তার দু' ধারে নানা রকমের দোকান, অধিকাংশই খাবারের, অনেকগুলো ফটো তোলার স্টুডিও। একটু ফগ আছে বলে সেরকম পাহাড়ও চোখে পড়ছে না। বাস থেকে নেমে অবধি শুভর মনে হচ্ছিল কি যেন একটা নেই; হঠাৎ বুঝতে পারল সেটা কি। বিয়াসকে কোথায় ফেলে এল? বিয়াসের ঢেউ,

তার গর্জনে এতক্ষণ অভ্যস্ত হয়ে গেছিল, এখন বিয়াসের সন্ধানে আশেপাশে চোখ ঘোরাল সে।

কিন্তু খোঁজার সময় নেই, কারণ বাবা এতক্ষণে ভাঙা হিন্দীতে তাদের হোটেলের লোকেশন সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে নিয়েছেন। অগত্যা বাবার পিছন-পিছন চলো।

হোটেল 'মানালি কুইন'-এর বাইরের রূপ আকর্ষণীয়। ভিতরেও ছিমছাম সাজানো। হোটেলের লবিতে অবধারিত ভাবে এক বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ। রেজিস্টারে শুভর বাবার নাম-ঠিকানা লেখা শেষ হয়েছে, এমন সময়ে—

'নমস্কার। কলকাতা থেকে এলেন নাকি?'

গায়ে র‍্যাপার জড়ানো, গোলগাল চেহারার এক ভদ্রলোক, যাঁকে দেখেই এক নজরে বলে দেওয়া যায় বাঙালী।

'হ্যাঁ। আপনিও কলকাতার?' প্রতিনমস্কার করে শুভর বাবা জবাব দেন।

'হ্যাঁ। যাদবপুরে থাকি। আমার নাম শঙ্কর দাশগুপ্ত।'

'আমি উমানাথ মিত্র। আমার স্ত্রী, ছেলে শুভ।' স্ত্রী কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে উমানাথ বলেন, 'চল, আমাদের ঘরের দিকে এগোনো যাক। আচ্ছা মিঃ দাশগুপ্ত—'

'কত নম্বর ঘর দিল আপনাদের?' শঙ্করবাবু ছাড়বার পাত্র নন।

'সাত নম্বর।'

'বাঃ, আমার ঠিক পাশের ঘর। চলুন আমি দেখিয়ে দিই। আমার স্ত্রী আর পুত্র-কন্যাকে নিয়ে পাশের দুটো ঘরে আছি। এই দু'দিন হল এলাম। মানালি জায়গাটা ভাল, তবে কি বুঝলেন না, সব কিছুর দাম একেবারে আকাশ-ছোঁয়া। বিশেষ ক'রে খাবার—টু-উ-উ এক্সপেনসিভ। এই যে, এইটা আপনাদের ঘর। নাথার সেভেন।'

শুভ বুঝতে পারে, তার নিজের মত বাবাও ভদ্রলোকের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে চাইছেন। শুধু গায়ে পড়ে আলাপ করার জন্য নয়, বাবার চোখ-মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এতক্ষণ ধরে বাস-জার্নি করে ক্লান্ত। কপালের কোণে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

'টায়ার্ড হওয়ারই কথা'—মনে মনে ভাবল শুভ, 'আমারই গা-হাত-পা ব্যথা করছে আর বাবা তো পঞ্চাশ ক্রস করে গেছে—ফিফ্‌টি-টু রানিং!'

সাত নম্বর ঘরের সামনে টানা বারান্দা। তার এক-ধারে চেয়ারে বসে গল্প করছে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। শুভরা এসে পড়ায় তারা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। শুভ লক্ষ্য করল মেয়েটির বয়স বছর পনেরো-ষোলো হবে। বেশ অ্যাট্রাকটিভ দেখতে। পাশের ছেলেটা—নিশ্চয়ই ওর ছোট ভাই হবে—নেহাৎই বাচ্চা, দশ-বারো বছর বয়স। শুভর হাত অজান্তেই নিজের মাথায় চলে গেল—বাসের হাওয়ায় চুলের যা অবস্থা হয়েছে!

শঙ্করবাবু হয়ত ওদের গৃহপ্রবেশ না করিয়ে ছাড়তেন না, কিন্তু উনি সাত নম্বরের দরজা দিয়ে ঢোকার আগেই পাশের ঘর থেকে এক মহিলার মাথা উঁকি দিল—

'শুনছ! একটু দরকার আছে।'

'ওফ্, আবার কী দরকার পড়ল?' বিরক্তিতে কপালটা কুঁচকে ওঠে শঙ্করবাবুর। 'আচ্ছা মিঃ মিত্র, মিসেস মিত্র—দেখে আসি একবার। পাশাপাশিই তো আছি, ঘনঘন দেখা-সাক্ষাৎ হবে নিশ্চয়ই।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি আসুন।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন উমানাথবাবু।

সাত নম্বর ঘরটা যথেষ্ট বড়—ডাব্‌ল্ বেডরুমে এক্সট্রা চার্জ দিয়ে তিনজনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। শুভর মা বিছানার চাদর, বালিশ ভাল করে দেখে বললেন, 'বিছানাপাটি বেশ পরিষ্কার।' দেয়াল-আলমারী খুলে আরও খুশী, 'কম্বল, তোয়ালে, সবই রাখা আছে—দেখেছ?'

উমানাথবাবু ততক্ষণে বিছানার উপরে বসে পড়েছেন। ওঁর মুখের ভাব দেখে কল্যাণী তাড়াতাড়ি স্বামীর কাছে এগিয়ে যান। 'কি গো, শরীর-টরীর খারাপ করল নাকি?'

'না না। জাস্ট টায়ার্ড লাগছে। এত লম্বা বাস-জার্নি—'

'তা লাগবে না? বয়স তো বাড়ছে আস্তে আস্তে। শুভকে তখনই বললাম, কুলু-মানালি আমাদের বয়সে পোষাবে না, অন্য কোথাও চল্!—তুমি একটু শুয়ে পড়ো।'

'সুটকেসপত্র যা খোলার আমি খুলছি। এখানে চা-টা

পাওয়া যায় না? এক কাপ গরম চা খেলে হয়ত ভাল লাগত।...শুভ, এই শুভ! তুই আবার এই ঠাণ্ডার মধ্যে জানলা খুলে কি করছিস?'

'শুনতে পাচ্ছো মা, বিয়াসের আওয়াজ?'

সত্যিই তো। কান পেতে শোনেন কল্যাণী, গুন্‌গুন্ একটানা শব্দ, বিয়াসের জল পাথরের বুকে আছড়ে পড়ছে, আবার এগিয়ে চলেছে। কিন্তু এখন তো কাব্য করলে চলবে না, এঁর শরীরটা—

'ওসব পরে হবে এখন। জানলাটা বন্ধ করে একটু চায়ের খোঁজ কর্ তো। বাবার শরীরটা ভাল ঠেকছে না।'

সেন্‌সিটিভিটি বলতে যদি কিছু থাকত! দুম্ করে জানলা বন্ধ করে শুভ। বাবাও যে কি—বাহান্ন একটা সাংঘাতিক কিছু বয়স নয়। অথচ এর মধ্যেই বাবা কিরকম বুড়োটে হয়ে যাচ্ছে। দরজা খুলে বাইরে বেরোল শুভ—আড়চোখে দেখল তাদের প্রতিবেশী মেয়েটি তখনও চেয়ারে বসে। তৎক্ষণাৎ উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে শুভ তার বেস্ট র‍্যাম্বো-স্টাইলে হাঁটতে হাঁটতে ব্যালকনি পেরিয়ে রিসেপশনের দিকে বাঁক নিল।

চা খেয়ে বাবা অনেকটা ধাতস্থ হলেন। মা ততক্ষণে সুটকেস খুলে দরকারী জিনিস সব বার করেছেন—হোটেলের কামরা ধীরে ধীরে ঘরের রূপ নিচ্ছে। সত্যি, মার কি এনার্জি! বিছানায় শুয়ে শুয়ে মায়ের ব্যস্ততা দেখছিল শুভ। অথচ বাবার থেকে মাত্র তিন বছরের ছোট। শুভর মনে মনে ইচ্ছে করছিল আবার জানলা খুলে নদীর গর্জন শোনে, কিন্তু জানে যে, মা পিট্‌পিট্ করবে—ঠাণ্ডা লাগবে, জানলা খুলিস না! এই ট্রিপটায় কতদূর কি ঘোরা হবে কে জানে? মা-বাবার অ্যাডভেঞ্চারের দৌড় শুভর জানা আছে। খবরের কাগজ আর চায়ের কাপ হাতে পেলে বাবা বিশেষ কোথাও নড়তে চান না। আর মা-র এনার্জি যত সাংসারিক কাজে। কিন্তু একটু বেশী হেঁটে কোথাও যেতে বল, তখন পায়ে ব্যথা, কোমরে ব্যথা! নিজের কিছু না হলে তখন বাবার অজুহাত দেখাবে—তোর বাবা পেরে উঠবে না। মানালি আসা তো এই অজুহাতে বানচাল করে দিচ্ছিল—বাবাই শেষ পর্যন্ত জোর দিয়ে বলল, শুভর এত ইচ্ছে, মানালি থেকেই ঘুরে আসা যাক্!

সে-রাতে শঙ্করবাবু আবার হানা দিতে পারেন, এরকম একটা ভয় শুভদের সকলেরই ছিল। কিন্তু উনি আর আবির্ভূত হলেন না। অতএব তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া সেরে শুয়ে পড়ল ওরা তিনজন। অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে কলকাতার কথা ভাবতে চেষ্টা করল শুভ, কিন্তু কেমন যেন আনরিয়াল লাগছে। তাদের কলেজ, যেখানে সে সবে ভর্তি হয়েছে, নতুন বন্ধুদের মুখ—মনে করার চেষ্টা করল; সবই কেমন ঝাপসা। এমন কি তাদের ক্লাসের সেরা সুন্দরী—কি যেন নাম, হ্যাঁ, অপিতা—সেই অপিতার মুখও খুব স্পষ্টভাবে মনে করতে পারছে না। অথচ অপিতাকে প্রথম দিন দেখেই শুভ বেশ ঘায়েল হয়েছিল। ও একা নয়, ওদের ক্লাসের অনেক ছেলেরই একই অবস্থা। কিন্তু এখানে হোটেলে শুয়ে বারবারই কিছুক্ষণ আগে দেখা মেয়েটার মুখ মনে পড়ছে। নিশ্চয়ই শঙ্কর দাশগুপ্তর মেয়ে হবে! যার বাবা অত বোর করে, সে কি আর ইন্টারেস্টিং হবে? অবশ্য দেখতে বেশ মিষ্টি। পাশের ঘরেই থাকে যখন, আলাপ হয়ে যেতে পারে। হঠাৎ বিরাট হাই উঠল শুভর। নাঃ—পাশ ফিরে শুয়ে ভাবল শুভ, রাইট নাও ইট্‌স্ টাইম ফর আ গুড স্লীপ! কালকে সকালে, মানালি, হিয়ার আই কাম্!

পরদিন সকালে উঠে শুভ একেবারে ঝরঝরে, তাজা। জানলার পর্দা সরিয়েই খুশীতে ঝিকমিকিয়ে ওঠে ওর মুখ। বিয়াস বয়ে চলেছে স্রোতে—চওড়া নদীর বুক জল আর পাথরের সংঘাতে ফেনিল।

'মা, শীগ্‌গির এস!'

দাঁত মাজতে মাজতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসেন কল্যাণী। শুভর পাশে দাঁড়িয়ে বিপাশার ছুটে চলা দেখতে দেখতে অস্ফুটে বলে ওঠেন, 'কি সুন্দর!'

'এবার জানলাটা খুলে দিই? বাবা যা ঘুমোচ্ছে, জাগবে না। জলের আওয়াজটা শুনতে ইচ্ছে করছে।'

মায়ের সম্মতি পেয়ে কাঁচের জানলা হাট করে খুলে দেয় শুভ। সঙ্গে সঙ্গে ঘর ভরে ওঠে নদীর কলকল ধ্বনিতে। বিয়াসের অন্য পাড়ে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গা কেটে উঠে যাওয়া পিচের রাস্তা—তাতে গাড়ি, মানুষজন চলাচল করছে। নদীর দুই পাড়ের যোগাযোগ রক্ষা করছে একটি সেতু, যা দিয়ে যানবাহন এপার থেকে ওপারে যাচ্ছে।

'আরে দেখেছ, কিরকম পতাকার মত ঝুলিয়ে রেখেছে

হতো দিয়ে?' শুভ আঙুল দিয়ে দেখায়।

নদীর বুকের উপর দিয়ে টাঙানো অনেক সুতো হাওয়ায় দুলছে, যাতে লাগানো আছে ছোট ছোট রঙীন কাগজ।

'ওগুলো বোধহয় তিব্বতীদের কোন ব্যাপার। কোন মানত পূর্ণ করার জন্য ঝোলায় বা ঐ ধরনের কিছু।'

'তুমি কোত্থেকে জানলে?' অবাক হয়ে বলে শুভ।

'কেন, তুই কি ভাবিস তোর মা কিছুই জানে না?' মা অল্প হাসেন।

'তাই বললাম নাকি?' বিব্রত কণ্ঠস্বর শুভর। আসলে মনে মনে সত্যিই সে মাকে যেন অজ্ঞদের দলে ফেলে দিয়েছে। আমার কি দোষ?' সে ভাবে। 'মা সারাক্ষণ রান্না, খাওয়া, বাবার দেখাশুনো আর ঠাকুরঘর নিয়েই আছে। জোর করেও একটা সিনেমা দেখতে নিয়ে যাওয়া যায় না, নিজেকে সোশ্যালাইজ করে না। পার্থ, জয়, ওদের সকলের মায়েরা কিরকম স্মার্ট, গড়গড় করে ইংলিশ বলে…'

'কিরে, হাত-মুখ ধুবি, নাকি সারা সকাল জানলায় দাঁড়িয়ে থাকবি?' শুভকে আলতো ঠেলা মেরে আবার বাথরুমে ঢুকে যান মা।

চানটান সেরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল শুভ। আজকাল ওর চুল ঠিকমত আঁচড়াতে বেশ অনেক সময় লেগে যায়—চুলের ঢেউ-খেলানো ভাবটা কি করে বাগে আনা যায়, সেই নিয়ে সে মহাসমস্যায় ভোগে। আজ আবার এক নতুন প্রবলেম—কপালের একধারে একটা লালচে ফোড়া উঠছে। ওঃ, হেল্! তাড়াতাড়ি একগোছা চুল সামনের দিকে এনে সেটাকে ঢাকার ব্যবস্থা করে শুভ। অবশেষে একটু পিছিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখে মনে মনে অখুশী হয় না। নীল জিন্সের সঙ্গে খয়েরী সোয়েটারের কম্বিনেশনটা ভালই দেখাচ্ছে। আয়নার সামনে থেকে সরে এসে শুভ লক্ষ্য করে যে বাবা এখনও শোওয়া।

'বাবা, উঠবে না? ন'টা বাজতে চলল। ব্রেকফাস্ট করে বেরোব।'

'শুভ, বাবা, আজ সকালটা হোটেলে থাকলে হয় না?' বাবার স্বর কুণ্ঠিত। 'এই তো কাল এসে পৌঁছলাম। আজ দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর না হয় বেরোব।'

'তুমি উঠে দেখ না? উঠলেই ভাল লাগবে। বেড়াতে এসে শুয়ে থাকার কোন মানে হয়?'

'শুভ!' মা ধমক দেন। 'বাবার শরীর ভাল নেই, গতকালই দেখেছ। আজ একটু রেস্ট নিতে দাও।'

'কিন্তু মা, কত দেখার জায়গা আছে! রোটাং পাস, বশিষ্ঠের হট ওয়াটার স্প্রিং…

'সব হবে। এখনও তো চারদিন হাতে আছে। এতটা জার্নির ধকল গেছে তো—দেখবি আজ বিকেলেই তোর বাবা চাঙা হয়ে গেছে। এখন খোঁজ নিয়ে ছাখ্, এত বেলায় আবার ব্রেকফাস্ট পাওয়া যায় কিনা।'

'খোঁজ নিচ্ছি।…মনে হচ্ছে, তুমিও বেরোবে না?'

'বাঃ, তোর বাবাকে একলা রেখে আমি বেড়াতে বেরোব?'

'আহা, আমি একা বেশ থাকব।' বাবা বাধা দিয়ে ওঠেন। 'তুমি শুভর সঙ্গে বেরোও না।'

'না না, তা হয় না। তাছাড়া আমারও হাত-পায়ে ব্যথা আছে। শুভ না হয় শহরটার এদিক-ওদিক ঘুরে আসুক—কণ্ডাক্টেড ট্যুরগুলোর সময় জেনে আসবে এখন।'

'বেশ, হোটেলে বসে থাকতে চাইলে তোমরা থাক। আমি খেয়েই বেরিয়ে যাব। একটা জায়গায় বেড়াতে এসে ঘরে বসে থাকার যে কি মানে…'

খুব মেজাজ খারাপ করে ব্রেকফাস্ট সারে শুভ। কোন মতে খাওয়া শেষ করে হাত-মুখ ধুয়ে ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে ছোট্ট করে বলে, 'বেরোচ্ছি।'

'দুপুরে এখানে এসে খাবি তো?' মা-র মাথায় খাবার চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা থাকে কিনা মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় শুভর।

'আমি কখন ফিরব জানি না। তোমরা খেয়ে নিও—আমার জন্য ওয়েট কোরো না।' মাকে আর বেশী কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বাইরে বেরিয়ে যায়।

হোটেল থেকে বেরিয়ে ডিসিশন-প্রবলেম। বাঁয়ে যাবে না ডাইনে? বাঁদিকে হোটেলের জানলা থেকে দেখা ব্রিজ পেরিয়ে বিয়াসের ধার দিয়ে সেই রাস্তা, ডান দিকে গেলে বাজার পাঁচ মিনিটের পথ। বাঁ দিকের রাস্তাই টানল।

ব্রিজ পেরিয়ে শুভ দেখল রাস্তার পাশে ফলকে লেখা আছে—'লেহ্—মানালি সড়ক'। বাব্বাঃ, এই রাস্তা লেহ্ অবধি গেছে! বিয়াসের পাড় ধরে হাঁটতে শুরু করে শুভ।

হ্যাঁ, এবার বুঝতে পারছে মানালির সৌন্দর্যের এত খ্যাতি কেন? তার বাঁদিকে কেনা তুলে বয়ে চলেছে বিয়াস, তীরে ঘন পাইনের জঙ্গল। ডানদিকে পাহাড়ের উঁচু মাথা স্পর্শ করেছে আকাশ। পাহাড়ের গায়ে আপেলের বাগান—লাল ফলের ভারে সব গাছ নুয়ে পড়েছে। কাউকে জিজ্ঞেস না করে আপেল পাড়বে কিনা ভাবছে, এমন সময় শুভ দেখল তার সামনে একটা কমবয়সী ছেলেদের দল দিব্বি আপেল গাছ থেকে আপেল পেড়ে খাচ্ছে। ব্যস্, সে-ও একটা পেড়ে কামড় বসাল। আঃ, দারুণ! ওয়াট আ ফিলিং! ক্যামেরা কাঁধ থেকে নামিয়ে আপেলটা কায়দা করে দাঁতে কামড়ে পটাপট্ আপেল গাছের কয়েকটা ছবি তুলে নিল শুভ।

এগোতে এগোতে পথের একটা বাঁক ঘুরে হঠাৎ দেখে—ফ্যানটাসটিক! সামনে সবুজ পাহাড়ের সারির পিছনে সাজানো বরফে ঢাকা দুধ-সাদা পাহাড়ের রেঞ্জ। বিউটিফুল! নদী, পাহাড়, সব মিলিয়ে যা ছবি আসবে না—আরও কয়েকটা ছবি তোলা হয়ে যায় খুশীর চোটে। হঠাৎ শুভর খেয়াল হয় যে সে জানে না সে কোথায় যাচ্ছে! কিছু লোক যাচ্ছে বটে এ রাস্তায়—কিন্তু কোথায়? পাশে একটা ঢাবায় ঢুকে এক গ্লাস চা অর্ডার করে দোকানীর কাছে খোঁজ নেয়। এই রাস্তা নাকি চলে গেছে সোজা রোটাংপাস। কিন্তু সে অনেক দূর—বাসে যেতেই কয়েক ঘণ্টা লাগে। কাছে হাঁটা-পথে বশিষ্ঠের উষ্ণকুণ্ডে যাওয়া যায়; সেখানে গরম জলের কুণ্ডে লোকে স্নান করতে যায়। গুড আইডিয়া! বশিষ্ঠে গিয়ে শুভ সেকেণ্ড টাইম স্নান করবে—বাবারা হোটেলের ঘরে ঘুমোক্!

বশিষ্ঠের দিকে হাঁটতে হাঁটতে আফসোস হয় শুভর—কেন বন্ধুদের সঙ্গে আসার প্রোগ্রাম করল না! ওর পাশ দিয়ে দেশী-বিদেশী বেশ কয়েকদল ট্যুরিস্ট গেল। বিদেশীরা প্রায় সকলেই জোড়ায় এসেছে। ভারতীয়দের মধ্যে কিছু ফ্যামিলি, কিছু দল বেঁধে হুল্লোড়ে ছেলেরা। বড্ড একা মনে হল নিজেকে। এত সুন্দর জায়গায় একা বেড়াতে আসতে হল। নতুন করে রাগ হচ্ছে বাবা-মার উপর; কোন স্পিরিট নেই, যেন দুই বুড়োবুড়ী এসেছে!

কিছুদূর এগিয়ে শুভ দেখে যে সামনের যাত্রীরা পাকা রাস্তার পাশে পাহাড়ের গা বেয়ে এক হাঁটাপথে উপরে উঠছে। এটাই তবে বশিষ্ঠে যাওয়ার রাস্তা। পাথর থেকে পাথরে পা রেখে স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠে শুভ। ধীরে ধীরে গতি কমে আসছে, দম জানান দিচ্ছে। আর একটু, আর একটু। ব্যস্, এটাই শেষ সিঁড়ি। উপরে উঠে দেখা গেল দিব্বি স্নানের ব্যবস্থা করা আছে সেখানে। চারদিক ঢাকা ছোট ছোট স্নানের জায়গা ভাড়া করা যায়, তোয়ালেও ভাড়া পাওয়া যায়। নিজের জিনিসপত্রও জমা দেবার ব্যবস্থা আছে।

উষ্ণকুণ্ডে স্নান করে যেন নতুন জীবন এল। নিজেকে একেবারে চন্‌মনে তাজা লাগছে। বাইরে রোদে বেরিয়ে এসে একটা অ্যাপ্‌ল্ জুস নিয়ে সিমেন্টের ছাতার তলায় চেয়ার টেনে নিয়ে বসল শুভ। সামনে প্রকৃতি অকৃপণ হাতে নিজের পসরা সাজিয়ে রেখেছে। পাহাড়ের পর পাহাড়, তার বিশালতা বোঝানোর ভাষা ওর জানা নেই। অনেক নীচে নুড়ি-পাথরের কোলে বয়ে চলেছে বিয়াস, তার তীরে আপেলের বন। শুভ বসে আছে পিঠ রোদে দিয়ে—মাথাটা ছায়ায়। আপেলের রসকে মনে হচ্ছে অমৃত। এখানেই বাকী লাইফটা কাটিয়ে দিলে হয় না? কলেজ-টলেজ গুলি মারো!

'কি ব্যাপার? একা একা?'

ও গড্! শঙ্করবাবু!

'হ্যাঁ, মা-বাবা হোটেলেই থেকে গেলেন।'

'বেশ, বেশ। একা একা বেরোনো ভাল—এই তো অ্যাড-ভেঞ্চারের বয়স। আরে তোমাদের বয়সে আমরা তো…'

সেরেছে, এখন ম্যারাথন সেশন শুরু করবে নাকি!

'বাবা, এখানে টাকা দিতে হবে'—পিছন থেকে শঙ্করবাবুর মেয়ে ডাক দেয়। ঠিক, কাল যাকে দেখেছিল, সেই মেয়েটি, নীল সালোয়ার-কামিজে দারুণ দেখাচ্ছে।

'যাচ্ছি, যাচ্ছি।' শুভর দিকে ফিরে শঙ্করবাবু বলেন, 'তুমি আছ তো? স্নান সেরে বেরিয়ে কথা হবে।'

'কিন্তু কাকু, আমি তো এক্ষুনি উঠছিলাম। আমার স্নান অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।'

বশিষ্ঠের আশ্রমে শান্তিভঙ্গ! আর কি থাকা চলে?

'ও! আচ্ছা চলি তাহলে।' শঙ্করবাবু বিদায় নেন।

জুসের বোতল ফেরত দিয়ে তড়িঘড়ি এগোয় শুভ। নামতে নামতে টের পায় যে খিদে বেশ চাগিয়ে উঠেছে।

উষ্ণকুণ্ডে স্নান করার ফল নাকি? বশিষ্ঠে আসার পথে যে চাবাতে চা খেয়েছিল, সেখানেই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলে হয়। কিন্তু বাবা-মা? ওরা হয়ত চিন্তা করবে। দোনা-মনা করে শুভ। তারপর মত স্থির করে নেয়—করুক্‌গে চিন্তা। হোটেলে গিয়ে ওদের সঙ্গে খাওয়া মানেই তারপরে ঘুম। বিকেলে উঠে যে কখন বেরোনো হবে তার ঠিক নেই। বরং একাই খাবে আর মজা করে খাবে।

লাঞ্চ ভাল হল রাস্তার পাশে ছোট্ট দোকানে। গরম গরম আলু-পরটা, তরকারী আর পায়েস বা স্থানীয় ভাষায় ক্ষীর। পেট শান্ত হলে শুভর মনে অশান্তি বাড়তে থাকে। আজ সকালে বাবার উপর অযথা মেজাজ করেছে। সত্যিই বাবার শরীর ভাল নেই। শরীর খারাপ নিয়ে তো আর বেড়ানো যায় না। গতকাল তো সে নিজেই ভেবেছিল যে বাবার টায়ার্ড হওয়াটা স্বাভাবিক, পঞ্চাশের উপর বয়স হয়েছে। অথচ আজ সকালে না বেরোতে এত রেগে গেল কেন? বড্ড রগচটা হয়ে গেছি আমি—

আত্মবিশ্লেষণ করে শুভ মনে মনে। হ্যাঁ, একথা ঠিক যে মা-বাবা দুজনেই একটু ওল্ড-ফ্যাশন্‌ড্—ওদের ঘড়ি যেন শুভর ঘড়ির থেকে একদম ভিন্ন গতিতে চলে। নানারকম চিন্তায় জর্জরিত হয়ে শুভ দ্রুত এগিয়ে চলে হোটেলের দিকে —ঘড়িতে দেখে তিনটে বেজে গেছে।

হোটেলে পৌঁছে ব্যালকনি দিয়ে নিজেদের ঘরের দিকে যেতে চোখে পড়ল যে শঙ্করবাবুর মেয়ে সেখানে চেয়ারে বসে বাইরে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করছে। সাত নম্বর ঘর থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই। মা-বাবা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। ওদের বিরক্ত না করাই ভাল। ইতস্তত করে নিজেদের ঘরের সামনে বারান্দায় রাখা একটা চেয়ারে বসে পড়ে শুভ।

সামনে পাহাড়ের দৃশ্য কয়েক হাত দূরে বসা মেয়েটিও দেখছে, শুভও দেখছে; কিন্তু মাঝে মাঝে চোখাচোখি হয়ে যাচ্ছে। নির্জন দুপুরে চোখের ভাষার এই আদান-প্রদানের কোন সাক্ষী নেই। এইবার একটা ছুতো করে আলাপ করে ফেললেই হয়। মনে মনে আলাপের মুখ ভাঁজতে থাকে শুভ। 'আপনারা কি আজই প্রথম বশিষ্ঠে গেলেন?' কিন্তু 'আপনি' কি রকম ফর্মাল শোনাচ্ছে!

'তোমরা যাদবপুরে থাকো?' এটাও বোকা-বোকা। শুভ তো শুনেইছে যে ওরা যাদবপুরে থাকে। বরং 'বশিষ্ঠে স্নান করতে কেমন লাগল?' নাঃ—বড্ড পার্সোনাল। মেয়েটা চটেও যেতে পারে।

'কি গো, ঘুমুলে নাকি?' হঠাৎ মা-র গলার আওয়াজে শুভর চিন্তার সুতো ছিঁড়ে যায়।

'না, ঘুম আসছে না। শুভটা এখনও ফিরল না!' বাবার গলা ক্লান্ত।

'না।'

'আজ শুভ বোধহয় আমার উপর খুব চটেছে, না?'

'কেন ওসব কথা ভাবছ?' মা অনুযোগ করেন।

'আসলে ও চায় ওর বাবা ইয়াং স্মার্ট হবে। আমি ওর সঙ্গে তাল দিয়ে চলতে পারি না। বুঝি, ওরও খারাপ লাগে—একা লাগে!'

'আচ্ছা তোমার হল কি বল তো?' শুভ বুঝতে পারে মা কথা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। 'এত সেন্টিমেন্টাল হচ্ছ কেন?'

'সেন্টিমেন্টাল নয়। আসলে যখন বুঝি যে ও আমাকে একেবারে বাতিলের দলে ফেলে দিয়েছে...'

'তা কেন? সে তো আমাকেও খুব ব্যাকডেটেড ভাবে! তাই বলে কি আমাদের ভালবাসে না?'

'সে কথা নয়। আসলে আমাদের দুজনের মধ্যে এমন একটা জেনারেশন গ্যাপ হয়ে গেছে! ওর পড়াশুনার খোঁজ রাখতে পারি না—আজকাল নতুন যে কি সব পড়ায়। একটা বই পড়ে এলে, কি সিনেমা দেখে এলে উৎসাহ নিয়ে বলতে আসে, কিন্তু আলোচনা করতে পারি না।'

'জেনারেশন গ্যাপ যে হয়েছে, তা কি ওর দোষ বা তোমার দোষ? কারোরই না। শুভ তো আর জানে না, আমাদের বিয়ে নিয়ে কত গণ্ডগোল—কেনই বা ও এত দেরীতে হয়েছে!'

বাইরে বারান্দায় বসে শুভর ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। বাবা-মার বিয়েতে গণ্ডগোল? সে আবার কি?

বাবার গলা শোনা যায় আবার।

'সেসব দিনের কথা ভাবলে এখন আশ্চর্য লাগে। তখন এত জোর পেতাম কোথা থেকে? তুমিও কি কম সহ্য

করেছ?'

'সহ্য করেছিলাম, তার ফলও পেয়েছি। শুভকে মোটা-মুটি ভাবে মানুষ করতে পেরেছি। আমাদের এখন অবস্থা ভালই। কিন্তু একটা কথা জানো, বাবাকে আর কোনদিন দেখতে পেলাম না, সে আফসোস বোধহয় আমার সারা জীবন যাবে না। এক কথার মানুষ তো।' সেই যে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম, ত্যাগ করলেন, তারপর মৃত্যুশয্যাতেও একবার দেখা করতে দিলেন না। শুভও ওর দাদু কি মামার বাড়ি কি কোনদিন জানল না!'

সাত নম্বরের বাইরে শুভ তখন ঘামছে। কি সব বকছে মা? বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে মা? একটু পরিষ্কারভাবে ভাবতে চেষ্টা করে শুভ। মা তো বরাবর বলে এসেছে দাদু, মামারা কেউ কলকাতায় থাকে না। তাই কোনদিন তাদের সঙ্গে দেখাও হয় নি। তাহলে কি সেসব কথা মিথ্যে?

'বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসা ছাড়া তোমার তো কোন উপায় ছিল না, কালু! উনি তোমাকে জোর করে অন্য জায়গায় বিয়ে দিতেন। তাও বিয়ে না করে বাড়িতে থাকতে পারা যায়, যদি পরিবারের অন্য সকলের মত থাকে। তা তোমার দাদাও তোমার বাবার পক্ষে ছিল, তোমার মা তো কবেই গত হয়েছিলেন!'

'এখন আমি দাদার দিকটাও বুঝি, জানো? আমার তখন কত বয়স?—আঠেরো-উনিশ হবে! হঠাৎ পড়ার মাস্টারকে বিয়ে করবো বলে বেঁকে বসলাম। তোমার তখন রোজগার বলতে টিউশনির কিছু টাকা। দাদা কি বলে আমাকে তোমার হাতে তুলে দেয়? তারপর যে কত কষ্ট করে তুমি চার্টার্ড পাস করবে, বড় চাকরি করবে, তা কি দাদা জানত? আমাদের বনেদী, বড়লোক পরিবার—একজন মাস্টারের সঙ্গে সে বাড়ির মেয়ের বিয়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

'আমরা একদিন সাহস করে এই কাজ করেছি, এখন বিশ্বাস করতে পার? তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে, কল-কাতায় কত বছর একা পেয়িং গেস্ট থেকে টিউশনি করলে। তোমার আমার টিউশনির টাকায় পড়ার খরচ চালিয়ে জীবনে দাঁড়ালাম। বোনেদের একে একে বিয়ে দিলাম। অবশেষে বিয়ে করে তোমাকে ঘরে আনতে পারলাম। এখন যেন ইতিহাস বলে মনে হয়!'

'ইতিহাসই বটে।' মার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। 'এসব পুরোনো কথা তুললে—বাবার কথা বড় মনে হচ্ছে। মরার আগেও একবার দেখতে পেলাম না।' শুভ শুনতে পায় মার গলা বুজে আসছে।

গত কয়েক মিনিটে শুভর জগতে যেন তোলপাড় হয়ে গেছে। তার ব্যালকনির সঙ্গিনী যে কখন উঠে ঘরে চলে গেছে সে জানে না। সে খালি ভাবছে, তার নিজের জগতে অতি পরিচিত জগতে এত রহস্য লুকিয়ে আছে? এতদিন তার ধারণা ছিল যে বাবা-মাকে সে আদ্যোপান্ত জানে, এমন কি তারা কখন কি ভাবছে তা-ও বলে দিতে পারে। আর এখন? এক্ষুনি শোনা ঘটনার সঙ্গে যে মানুষ দুটোকেই মেলাতে পারছে না।

মার চেহারা ভেসে ওঠে শুভর মনে। লম্বায় মাঝারী, একটু মোটার দিকে, ফর্সা। পাতলা চুল ঘাড়ের কাছে খোঁপা করে বাঁধা। নেহাৎই সাদামাটা বাঙালী চেহারা। হ্যাঁ, মার চোখ দুটো বড় স্নিগ্ধ। কিন্তু শুভ তো মার চোখে মার নরম স্বভাবের ছায়াই দেখে এসেছে, মায়ের কথায় সংসারের গণ্ডীর সংকীর্ণতা কানে বেজেছে। অথচ সেই মাকে এত ত্যাগস্বীকার করতে হয়েছে! অল্পবয়সে নিজের পরিচিত জগতের বেড়ার বাইরে বেরিয়ে এসে একা লড়াই করে অনিশ্চিত ভাগ্যের হাত থেকে নিজের ভবিষ্যৎ ছিনিয়ে নিতে হয়েছে। কত শক্ত, কত দৃঢ়সংকল্প হলে এভাবে নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকা যায়!

হঠাৎ ভারী ধাঁধায় পড়ে যায় শুভ। যে মানুষ দুটো তার এত চেনা, তারা হঠাৎ অচেনা হয়ে গেলে নিজেকে কেমন একা লাগে। তার বাবাকে কত কষ্ট করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়েছে। তার অল্পেতে ক্লান্ত-হয়ে-যাওয়া বাহান্ন বছরের বাবাকে জীবনে এত ঝড়ের মোকাবিলা করতে হয়েছে, সে তা স্বপ্নেও ভাবে নি। বাবাকে তো এক্ষুনি 'সুপারম্যান' বলে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। না, সেটা করলে বাবা হয়ত আঁতকে উঠবে। ভাববে ছেলের মাথা খারাপ হয়েছে। বরং সহজভাবে ঘরে ঢোকাই ভাল, যেন সে এইমাত্র বাইরে থেকে ফিরেছে।

শুভ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই উৎসুক দুটি মুখ তার দিকে

ফেরে। 'ফিরেছিস, বাবা? খাওয়া-দাওয়া করেছিস, না রাগ করে কিছু খাস নি?'

'খেয়েছি, মা। দারুণ লাঞ্চ হয়েছে। কিন্তু এত হেঁটেছি না, টায়ার্ড লাগছে। ভাবছি বিকেলটা হোটেলেই একটু রেস্ট নেব।'

'সে কি রে, আমরা তোর সঙ্গে বেরোব বলে ঠিক করে রেখেছি!'

'হ্যাঁরে, শুভ।' বাবা বলে ওঠেন, 'বিকেলের দিকে বাজারটা একবার ঘুরে আসব ভেবেছি।'

শুভ বাবার পায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলে, 'তুমি যেতে চাও যেও, আমি ঘুমোব। আচ্ছা সত্যি কথা বল তো, আর ইউ ফিট?'

বাবা বিব্রতভাবে বলেন, 'আসলে এখনও হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট ফিট নই রে! আজকে না বেরোলে ভালই হয়। কি করব বল্ বাবা, বয়স হচ্ছে…'

শুভ হো হো করে হেসে ওঠে। 'বয়স হচ্ছে? তোমার? তুমি আর মা তো এভারগ্রীন, বাবা! তোমরা কক্ষণও, কোনদিনও বুড়ো হবেনা।'

কথাসাহিত্যের নিয়মাবলী

• কার্তিক শারদীয়া সংখ্যা থেকে বছর শুরু। তবে যে কোন সংখ্যা থেকেই গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৪৲।

• বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৬০৲।

• শারদীয়া ও বিশেষ সংখ্যাগুলির দাম বেশী হয়। কিন্তু গ্রাহকদের ঐসব সংখ্যার জন্য অতিরিক্ত মূল্য লাগে না।

• টাকা মনি অর্ডার বা ড্রাফ্‌ট-এ কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠাবার নিয়ম-কানুন

যাঁরা লেখা (গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি) পাঠাতে চান তাঁরা ডাকযোগে নকল রেখে লেখা পাঠাবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেওয়া হয় না। কোন লেখা সরাসরি হাতে নেওয়া হয় না। লেখা, চাঁদার টাকা, পত্রাদি পাঠাবার ঠিকানা :—

কথাসাহিত্য কার্যালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

KATHA SAHITYA. 10 Shyama Charan De Street, Cal-73